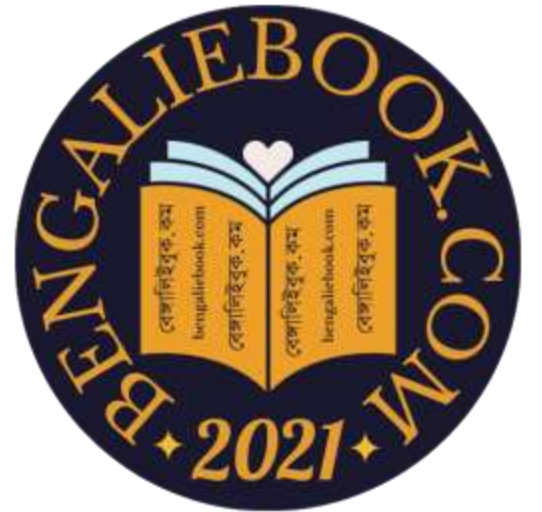


প্রবন্ধ

স্বাঃশ্রদর্শন

বফিম্‌চন্দ চট্টোপাধ্যায়



সাংখ্যদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ-উপক্রমণিকা

এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে যে সাংখ্য যে কীর্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ | বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয় | কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন | সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন | সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্যভূমি মুসলমান-পদানত

হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে এই ধর্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্মের আদি সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে “বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্যদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নির্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ১

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধর্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা “নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই।

সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তন্মিহ সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস, ভোজবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, চলিত, তাহাই আমদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কাপিল সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

১ বৌদ্ধধর্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে।

কতকগুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা জীবকে সৃষ্ট করিয়াছেন। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দেখিতে পায়?

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ—তাঁহারাও বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিতও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদকসেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গুস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী কার্বনিক অ্যাসিড-প্রধান বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রিদিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক

অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তী হওয়াতেও দুঃখ। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মাল্‌থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সূত্র), এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে তাহা দুঃখপক্ষে নিষ্ক্ষেপ করেন (ঐ, ৮)। দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাজ্জ্বা জন্মে না (ঐ, ৬)। অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সূত্র “অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।”

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটি নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন, এ সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি

আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সূত্র)।

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্বতের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নির্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জ্বালিত হইতে পারে বলিয়া যদি তুমি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্মপৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ সূত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখ-নিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে (ঐ ৫৪) ।

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি।

অপবর্গই বা কি? “দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গ |” (তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সূত্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। “অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্মকলঙ্কিত বা সর্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-বিবেক

আমি যত দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহে ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখদুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার সঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, “মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল সেই আত্মা।” এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উঁহারা মস্তিষ্কে তাহাই বলেন।

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শরীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্তে কেন? “অসঙ্গোহয়ম্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও

সংসর্গবিশিষ্ট নহে (১ অধ্যায়, ১৫ সূত্র) । অবজ্ঞাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে (ত্রৈ, ১৪ সূত্র) । “ন বাহ্যন্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ শ্ৰুণ্মুস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব |” বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরাজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্ৰুণ্মনগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ। পুরুষের দুঃখ কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিন্নিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থঃ (৬, ৭০) ।

সাংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যদি আত্মাই সুখ-দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু “যদি”গুলিন অনেক। আধুনিক পঞ্জিটিবিশিষ্ট এখনই বলিবেন,—

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ? শরীর তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখদুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তত্ত্বিগ্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে; দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব বা।

৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদি জ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়; প্রকৃতিবিষয়ে যে যে অবিবেক, সকল অবিবেক, তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি” (knowledge is power); হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি”। দুই জাতি দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তি-অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে

সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্রসকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্য্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সূত্রগ্রন্থসকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সৃষ্টি

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদিকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্ত্তা একজন আছেন। সামান্য ঘটপটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইঁহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে

চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্, তত্ত্ব, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্ তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিপ্রক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।”

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন মত অযথার্থ, কোন মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যিকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যিকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি “সর্ববিৎ সর্বকর্তা” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেন না, কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যিকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)।

জগদ্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্বসংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যিকারের উত্তর এই;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূল ভূত। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। “আমি” জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন। ১

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে, ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। তবে “আমিও” আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে (Cogito ergo Sum.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে। সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যিক নাই। একালে উহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদদেশীয় পুরাণকালে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র।

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় না। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহাদাদির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐরূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ্ণু, ভাগবত এবং লিঙ্গপুরাণের পূর্বে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন অংশ নূতন, কোন অংশ

পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসম্বন্ধে দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মসূত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।

সাংখ্য-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

১ Mind নহে; Consciousness.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-নিরীশ্বরতা

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত;—কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাঞ্জলিকর্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদিবিদ্বানের উপাসক | অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে | সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল সূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র এই—
“ঈশ্বাসিদ্ধোঃ” প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ বিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “যৎ সম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্ |” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন কোন প্রমাণ নাই; অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না

বর্ত্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে, ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার ও চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব; ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্তি। “কোন পদার্থ আছে, এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত।

অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,—তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,—কিন্তু আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছে, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসি লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে, চেতনাদি মানসিক বৃত্তিসকল শরীর হইতে বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক। “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর

নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সূত্র একত্র করিয়া, সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২), প্রমাণ নাই বলিয়া অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫, ১০)। সাংখ্যমত প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তু নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ৫, ১১)।

যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে, মনুষ্যমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সহিত দ্বিভূজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ—শব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদেই আশ্চোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান-কার্য্যত্বস্য। ৫, ১২); কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন, তিনি

দেখিবেন, এ অতি সঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা (মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। ১, ৯৫)।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হইলেন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন—বদ্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়েরন্যতরাভাবাপন্ন তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩); উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ (১, ৯৪)।

সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হইলেন, তবে তিনি অবশ্য ফলনিষ্পত্তি করিবেন, পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কোন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের পূর্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকে বলেন, কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তু, অ, ৫৭ সূত্রে সূত্রকার বলেন, “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা |” সে কি প্রকার ঈশ্বর? “স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্তা,” ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই?

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ত্ববিশ্বাল উর্দ্ধলোকেও মুক্তি নাই; কেন না, তথা হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎকারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি “সর্ববিৎ এবং সর্বকর্তা |” ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎস্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। “সর্বকর্তা” অর্থে সর্বশক্তিমান, সর্বসৃষ্টিকারক নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-বেদ

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্মপুস্তকের প্রমান্য স্বীকার করে অথচ ধর্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম কর্ম, এবং অবস্থা নির্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু; অশক্য অপ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর্ভুজ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ, সেই সৈন্যপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্বলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য | যাহারা ধর্ম-জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, যেখানে যেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গত সর্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতা গণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য, তাহাও বেদ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবাদের রূপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও ঋগ্‌যজুঃসামাত্মক বলা হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্বেও আছে বটে, বেদ শব্দ হইতে সর্বভূতের রূপ নাম কর্মাদির উৎপত্তি।

ঋকসংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য ও মাধবাচার্য লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নির্মাণ হইয়াছে।”

এইরূপ সর্বত্র বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্মগ্রন্থের, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুই ঈদৃশ মহিমা কীর্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা হইতে আসিল? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই।—এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

- (১) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।
- (২) অথর্ববেদে আছে, স্তম্ভ হইতে ঋগ্‌ যজুষ্‌ সাম অপাঙ্কিত হইয়াছিল।
- (৩) অথর্ববেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।
- (৪) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।
- (৫) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত।
- (৬) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে ঋচ, বায়ু হইতে যজুষ্, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি; ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে। এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।
- (৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।
- (৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণুর উৎপত্তি হয়। অণু হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।
- (৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার) নিশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্, সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা বেদাদি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু।

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্‌দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবত পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐরূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্বৃত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ্ ও যজুষ্, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মুর্দ্ধা হইতে অথর্কের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ববেদান্তর্গত আয়ুর্বেদে আছে যে, আয়ুর্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ অথর্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ববেদের ঐরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকল বেদের সৃষ্টত্ব এং পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিত্‌ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব—বাদী। তাঁহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৈত্তরীয় যজুর্বেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। ব্যবহারকালে কালিদাসদিবাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিত্য। এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়।—মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতমসূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলিকর্তা উদয়নাচার্যের এই মত।

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়; কেহ বলেন, বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না; কেন না, বেদেই তাহার কার্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা “স তপোহতপ্যত তস্মাৎ তপস্তপানা ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত |” যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না | কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয় নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে | সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ তিনি অসর্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথাঅঙ্কুরাদি (৫, ৮৪)। যাঁহারা হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই

মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্রা, ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধান-তাপ্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমাদের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাত্‌কালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্যিকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষের নহে, অপৌরুষেরও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, “দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে | বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে | তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, ইহা মনুষ্যকৃত; কেন না, সর্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে |” যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদয় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্মে থাকার উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মানিব?

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন “তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল, যাঁহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমন নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নব্যেরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আগুত্বাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য-প্রণীত সর্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বেদকর্তা অস্মর্য্যমান। সকল কথা লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, এমত প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পূর্বে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্তা কাহার কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন

কালিদাসাদিবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেও বাক্য। বাক্যত্বহেতু, মন্ত্রাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, যেই বেদধ্যয়ন করে, তাঁহার পূর্বে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে তাঁহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বলে যে, মহাভারতের কর্তা যে ব্যাস, ইহা স্মর্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংশি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত |” ইতি পুরুষসূক্তে বেদকর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে; কেন না, শব্দসামান্যত্ববশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমরাই প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহার গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞান সামান্য বিষয়ত্ববশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনর্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাঁহার তাল্লাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে, পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিবে কেন? এই তর্কের তিনটি মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে, ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা “ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে” ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্বৃত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এ বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার

আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমরাই নির্দেশ করিতে হয়।

১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভে “দ্বৈ বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ষবেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । ”

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২। ৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা
যমিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জনুকর্মফলপ্রদাম্।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং সমাধৌ না বিধীয়তে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রেণুণ্যো ভবাজ্জুন॥

৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ করে। ৪। ২৯, ৪২।

শব্দব্রহ্মণি দুস্পাপে চরন্ত উরবিস্তরে।

মন্ত্রলিঙ্গব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠতাম্॥

৪। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না। –যথা

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । ”

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্ব্বগামী পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল। ১

১ এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে।